

বাংলাদেশে ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন

মোহাম্মদ সফিউর রহমান

১. সারাংশ

ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি যে কোনো দেশের আইন ও প্রশাসনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলাদেশের আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থায়ও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি মালিকানা, ভূমি হস্তান্তর, ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি দখল ইত্যাদি নিয়ে এদেশে অহরহই মামলা মোকাদ্দমা ও দাংগা হাংগামা হয়ে থাকে। ভূমি সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধি সে জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহনকরে।

বাংলাদেশের ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার গোড়া পত্তন প্রধানতঃ বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে হয়। তবুও মোগল আমলের ভূমি আইন ও ভূমি বন্দোবস্ত নীতি বৃটিশ ভূমি প্রশাসনকে প্রভাবান্বিত করে। বাদশাহী লাখেরাজ রেগুলেশন এবং অবাদশাহী লাখেরাজ রেগুলেশন এর মধ্যে অন্যতম। তবে এর ওপর ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কেবলমাত্র প্রশাসনিক প্রভাবই ছিল না বরং এর ফলে সমাজের উপরও সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে। ১৯৫০ সনের জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায়নি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভূমি সংস্কারমূলক বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ভূমি রাজস্ব মণ্ডল, জমি বন্টন, জমি পুনরুদ্ধার, হাট বাজারের ইজারাদারী ইত্যাদি ছাড়াও গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনা এর মধ্যে অন্যতম। ১৯৮২ সনের ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ থেকে শুরু করে ১৯৯১ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত দুটি সংশোধনী অধ্যাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ। বিভিন্ন আইনে বর্গা

চাষীদের জমি ও ফসলের উপর অধিকার, ক্ষেত মজুরদের নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণ, চর এলাকার বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, ভূমির উৎপাদনশীলতা আশানুরূপ বাড়ছেনা। ভূমি-আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে হতেই থাকবে, কিন্তু বিভিন্ন আইনে সাধারণ মানুষ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে, ভূমির উৎপাদনশীলতা কতটুকু বাড়ছে, ভূমিহীন ও স্বল্পবিস্ত কৃষকের কতটুকু অবস্থার উন্নতি হচ্ছে সেটাই বিবেচ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রধানতঃ ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনার বিবর্তনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, তবে এর সামাজিক প্রভাব সম্পর্কেও কিছুটা ইংগিত দেয়া হয়েছে।

২. ভূমিকা

ভূমি মালিকানা, ভূমি হস্তান্তর, ভূমি দখল ইত্যাদি শুধু বাংলাদেশে এবং বর্তমান কালেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশের আইন ও প্রশাসনে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি সমধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এদেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অধিকাংশ প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভূমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই হয়ে থাকে। ভূমি আইনের বিবর্তন তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এদেশের ভূমি আইন ও ভূমি প্রশাসনের গোড়াপত্তন হয় মোগল আমলে। তৎপূর্বেও যে ভূমি কর, ভূমি বন্দোবস্ত ইত্যাদির প্রাধান্য ছিলনা এমন নয়। মোগল বাদশা হুমায়ুন যে চারটি ‘সরে-কার’ বা বা কর্ম বিভাগ সৃষ্টি করেন তন্মধ্যে সরে-কার-ই-খাক ভূমি বিভাগই প্রধান ছিল।^১ জরীপের ব্যাপারটি প্রধানতঃ হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দী পাঠান বাদশা শের শাহ এর অবদান। মোগল বাদশা আকবরের মন্ত্রী টোডর মলের ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ প্রজ্ঞা ছিল। তাঁর পরামর্শে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে সুবা, জেলা, পরগণা, মোজা ইত্যাদিতে বিভক্ত করেন।

বাদশাহী আমলের ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থাপনা পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে বাদশাহী লাখেরাজ রেগুলেশন এবং অবাদশাহী লাখেরাজ রেগুলেশনে বিভক্ত হয়। লাখেরাজ অর্থ নিষ্কর। লাখেরাজ বলতে দু’প্রকারের নিষ্কর ভূমি বুঝাত- বাদশাহী লাখেরাজ এবং অবাদশাহী লাখেরাজ। অবাদশাহী লাখেরাজ বিষয়ক আইনটি ১৭৯৩ সনের ১৯ নম্বর রেগুলেশন এবং বাদশাহী লাখেরাজ বিষয়টি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩৭ নম্বর রেগুলেশনে বিধিবদ্ধ হয়। বাদশাহী লাখেরাজ রেগুলেশন আল- তামাগা, আয়মা, মাদাদমাশ, নাজারাত, সায়রঘাল ও জায়গীর-এ ছয় প্রকৃতির ছিল।

১. ‘সরেকার’ শব্দটি ফারসী, যার অর্থ কাজের খাত বা কর্মবিভাগ। বাদশা হুমায়ুন প্রশাসনিক সুবিধার্থে চারটি কর্মবিভাগ সৃষ্টি করেন, যথা ‘সরে-কার-ই-খাক’ বা ভূমি বিভাগ, ‘সরে-কার-ই-আব/বা পানি বিভাগ’, ‘সরে-কার-ই-আতশ’ অর্থাৎ ‘অগ্নি বিভাগ’ (যুদ্ধ বিগ্রহ বিভাগ) এবং ‘সরে-কার-ই-হাওয়া’ অর্থাৎ আবহাওয়া বিভাগ। এই ‘সরেকার’ শব্দ থেকেই ‘সরকার’ শব্দটির উৎপত্তি।

‘তামাগা’ শব্দটির অর্থ সীলমোহর। লাল সীলমোহরযুক্ত উক্ত ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী আকারে একটি রাজকীয় অনুমোদনকে বুঝাত। এটা এমন একটা রাজকীয় দানপত্র ছিল যা গ্রহীতা এবং তদীয় উত্তরাধিকারীর জন্য একটা হস্তান্তরযোগ্য নিষ্কর জোত বা জমা বিশেষরূপে পরিগণিত ছিল।

‘আয়মা’ বলতে এমন একটা নিষ্কর ভূমি বুঝাত যা মুসলিম ধর্ম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অথবা বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে বা ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হতো। বিহার অঞ্চলের দিকেই এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল। কারো কারোর মতে জংগল পরিষ্কার বা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সামান্য কর বা খাজনার বিনিময়ে ভূমি প্রদানকে আয়মা বলা হতো।

‘মাদাদমাশা’ বলতে ভরণ পোষণের উদ্দেশ্যে সাহায্য করা বুঝায়। সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এধরনের বন্দোবস্ত প্রদান করা হতো। ‘নাজারাত’ বলতে মসজিদ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে অনুদান এবং ‘সায়ুরগাল’ বলতে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ফকির দরবেশ যারা পার্থিব জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করেছে তাদের জন্য অনুদান বুঝাতো।

জায়গীর বলতে অধিকৃত জায়গা বা ভূ-সম্পত্তিকে বুঝানো হতো।^২ জায়গীর প্রথা দু’ভাগে বিভক্ত ছিল— শর্তযুক্ত জায়গীর ও শর্তহীন জায়গীর। শর্তযুক্ত জায়গীর বাদশা বা সম্রাটের সামরিক বা বেসামরিক বিভাগীয় প্রধান বা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে প্রদান করা হতো। এরূপ জায়গীর বা দানপত্র ততদিন বলবৎ থাকতো যতদিন উক্ত কর্মকর্তা সে বিশেষ দপ্তরে দায়িত্বে থাকতেন। শর্তহীন জায়গীর বলতে কোন দপ্তরের সাথে সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র স্বাধীন দান বিশেষকে বুঝাতো। একে ব্যক্তিগত দানপত্র বলে গণ্য করা হতো।

অবাদশাহী লাখেরাজ অনুদানকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ করা হয়। যথা,

- ১। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্টের পূর্বে অনুমোদিত বা প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।
- ২। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট থেকে শুরু করে ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রদত্ত বা অনুমোদিত লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি।
- ৩। ১৭৯০ সালে ১লা ডিসেম্বর থেকে প্রদত্ত বা অনুমোদিত লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি।

উক্ত রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক লাখেরাজ বা নিষ্কর বা সরকারী রাজস্ব যুক্ত সম্পত্তি দখলকারী অথবা উক্ত অধিকারের দাবীদারের প্রকৃত স্বত্বের বৈধতা পরীক্ষা করে দেখা হয়। অনুরূপ ভাবে স্বত্বভোগকারীর প্রতি আরোপিত বার্ষিক জমা বা রাজস্ব সংগতভাবে নিরূপণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২. জায়গীর শব্দটি ফারসী ‘জাহ’ অর্থাৎ জায়গা এবং ‘গীর’ অর্থাৎ অধিকারী থেকে উৎপন্ন।

৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৯ সালে স্থানীয় দেওয়ানদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা তদারকের জন্য ইউরোপীয় সুপারভাইজারদেরকে নিয়োগ করেন। এ ইউরোপীয় সুপারভাইজারই পরবর্তী সময়ে কালেক্টর, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর ও পরবর্তীতে ডিপুটি কমিশনাররূপে পরিচিত। ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ সরকার ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব আদায় নিয়মিত করণ এবং এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কৃষকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হলে কয়েক বৎসর যাবৎ কেবল একসন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়। এর ফলে অনেক প্রতিষ্ঠিত জমিদার উচ্ছেদকৃত হন এবং কৃষির উন্নতি বিধানেও জমিদার বা কৃষক অনুপ্রাণিত হননি।

উচ্ছেদকৃত জমিদাররা ব্রিটিশ কমল সভায় এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। এর ফলে ১৭৮৪ সালে পিটস্ এর ভারত শাসন আইন পাশ হয় যার আওতায় উচ্ছেদকৃত জমিদারদের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার আদেশ দেয়া হয়। এ আইনের বিধান অনুযায়ী বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস জমিদার বা ভূ-স্বামীদের জন্য পরীক্ষা-মূলকভাবে একটি ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা সুপারিশ করেন এবং এ ব্যবস্থা সফল হলে স্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হবে বলে বলা হয়।

১৭৯৩ সালের ১লা মে সপরিষদ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ বেংগল রেগুলেশন নং ১ বিধিবদ্ধ করেন। এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। এ আইনের বিধান মতে উক্ত সনের ২২ শে মার্চ থেকে জমিদাররা নিম্নোক্ত সুবিধাদি লাভ করেনঃ-

- (১) নির্দিষ্ট সরকারী রাজস্ব সাপেক্ষে জমিদারদেরকে ভূমির একচ্ছত্র মালিকানা স্বত্ত্ব প্রদান করা হয়।
- (২) জমিদারদের উক্ত স্বত্ত্ব বংশানুক্রমিক এবং হস্তান্তরের যোগ্য বলে গণ্য করা হয়।
- (৩) জমিদাররা তাদের এলাকায় অবস্থিত সকল ভূমির খাজনা আদায়, খনিজ সম্পদ আহরণ, মৎস্য শিকার এবং অন্যান্য অশরীরী অধিকার জনিত বিষয়ের মালিকানা লাভ করেন।
- (৪) জমিদাররা সামগ্রিক খাজনা বা রাজস্ব বৃদ্ধির আওতা থেকে রেহাই প্রাপ্ত হন।
- (৫) জমিদারদেরক কতিপয় বিশেষ বিধিনিষেধ সাপেক্ষে ইচ্ছামত শর্তে তাদের অধীনস্থ প্রজা বা রায়তদের কাছে ভূমি বন্দোবস্ত বা ইজারা দেয়ার অধিকার প্রদান করা হয়।
- (৬) জমিদারদেরকে জলকর (মাছ ধরা সম্পর্কিত), বনকর (কাঠ সংগ্রহের অধিকার সম্পর্কিত), ফলকর (ফল সংগ্রহের অধিকার সম্পর্কিত) এবং খাস্কর (গো-চারণের অধিকার সম্পর্কিত) প্রভৃতি ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।
- (৭) ভূমি মালিকদের তাদের স্ব স্ব ভূ-সম্পত্তির উন্নতি বিধানের দায়িত্ব ও অধিকার প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত বিধান মোতাবেক জমিদারেরা তাদের সমুদয় সম্পত্তি বা অংশবিশেষ দান, উপঢৌকন, বিক্রয় বা অন্য যে কোন প্রকার আইন সংগত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করতে পারতেন। তবে উক্ত আইনে সরকারের হাতে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ সংরক্ষিত থাকে—

- (১) সপরিবদ গভর্নর জেনারেল, অধীনস্থ তালুকদার রায়ত এবং অপরাপর ভূমি চাষীর স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনবোধে কোন বিধি বিধান করার ক্ষমতা রাখেন।
- (২) জমিদার বা ভূ-স্বামীদের থানা বা পুলিশ বাহিনী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এবং পুলিশী ভাতা সামগ্রিক বা আংশিক পুনঃ প্রচলনের অধিকার বা ক্ষমতা সরকারের হাতে রক্ষিত হয়।
- (৩) স্থায়ী খাজনা নিরূপণের অধিকার সরকারের হাতে রক্ষিত হয় এবং এভাবে ধার্যকৃত কর বা খাজনা সরকারের প্রাপ্য হবে যাতে জমিদার বা ভূমি মালিকের কোন অধিকার থাকে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূ-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব জমিদারদের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দূরীভূত হয়। তাছাড়া রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সরকারী ব্যয় বহুাংশে কমে যায়। এতদ্ব্যতীত সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয় যাদের সরকারের প্রতি আনুগত্য রাখতে হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ সম্ভবতঃ এ ধারণাও পোষণ করেছিলেন যে, জমিদাররা ধনাঢ্য হবেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত বিলাসদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতঃ এ সম্পর্কিত শুদ্ধ প্রদান করে সরকারী কোষাগারকে সমৃদ্ধ করবেন। তাছাড়া ভূমির উন্নতি বিধানে জমিদারেরা বিশেষ সচেতন হবেন। শেষোক্তটি অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ অধিকাংশ জমিদাররা তাদের গ্রাম্য বসত-বাড়ী ত্যাগ করে শহরে বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হন। জমিদাররা অধীনস্থ প্রজাদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন শুরু করেন এবং দেশের সকল উদ্বৃত্ত মূলধন ভূমি ব্যবসাতে উৎপাদনহীন অবস্থায় বা অকেজো অবস্থায় পুঞ্জীভূত হয়।

৪. পত্তনী তালুক রেগুলেশন, ১৮১৯

১৮১৯ সনের ৮ নম্বর আইন বেংগল পত্তনী রেগুলেশন নামে খ্যাত। উক্ত আইনে অনিদিষ্টকালের জন্য বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট কর বা খাজনা ধার্যকরণ, উত্তরাধিকার সূত্রে ভূ-সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর যোগ্যতা এবং উচ্ছেদহীনতা স্বীকৃত হয়। তবে, বকেয়া খাজনার জন্য ভূ-সম্পত্তি সরাসরি বিক্রি এবং জমা ব্যর্থতায় ভূ-সম্পত্তি জমিদারের দখলে আনার ব্যবস্থাও ছিল।

৫. এলিউভিয়ন এন্ড ডাইলিউভিয়ন রেগুলেশন, ১৮২৫

নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে নদীর ভাংগন-গড়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূ-বন্দোবস্ত ও ভূ-মালিকানায় এর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এই প্রেক্ষিতে সরকার ১৮২৫ সনের ১১ নম্বর রেগুলেশন বিধিবদ্ধ করেন। উক্ত আইন পায়ওয়াস্‌থ ও সিকস্‌থ আইন বলেও পরিচিত। নদীর ভাংগনকে 'সিকস্‌থ' এবং নদীপাশে ভূ-গঠনকে 'পায়ওয়াস্‌থ' বলা হয়ে থাকে।

উক্ত আইনে বলা হয় যে:

- (১) নদী পাশে ভূ-গঠনে হলে এর মালিকানা দীর্ঘ প্রতিষ্ঠাত ও সুনির্দিষ্ট প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
- (২) যদি ঐ ধরনের স্থানীয় প্রথা না থাকে তাহলে:
- (ক) ধীরে ধীরে জাহত চরের মালিকানা নদীর উক্ত পাশের ভূ-স্বামী হবে, তাঁর সরকারকে খাজনাদিতে হবে।
- (খ) যখন কোন ভূমির অংশ অক্ষাংশ তীর থেকে বিচ্যুত হয় এবং অন্য অংশের সাথে যুক্ত হয় অথচ যুক্ত অংশের পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে ঐ অংশের মালিকানা মূল মালিকেরই থাকবে।
- (গ) যখন বড় নাব্য নদীতে চর জাহত হয় এবং চর থেকে নদীতীর পর্যন্ত বছরের কোন সময় হেঁটে যাওয়া যায় (fordable), তাহলে তীরবর্তী ভূ-স্বামী থাকলে সরকারকে রাজস্ব প্রদান সাপেক্ষে তিনি উক্ত চরের মালিক হবেন এবং এরকম তীরের মালিকানা কারো না থাকলে তা সরকারী খাস জমিরূপে পরিগণিত হবে।
- (ঘ) অনাব্য সর নদীতে চর জেগে উঠলে এবং দু'তীরের দু'জন মালিক হলে মাছ ধরার অধিকার (জলকর) এর মালিকের উপর উক্ত মালিকানা বর্তাবে।
- (ঙ) মালিকানা সংক্রান্ত কোন সংঘাত বা বিরোধ দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত হবে এবং আদালত স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত প্রথাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন।

উক্ত আইনের আওতায় লোপেজ বনাম মদন মোহন ঠাকুর এর মামলা সুপ্রসিদ্ধ। বাদী ফেলিক্স লোপেজ এর গংগা তীরবর্তী বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিকানা ছিল। নদীর ভাংগন ও গতি পরিবর্তনের ফলে ১৮৪০ সনে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং বিবাদীর সম্পত্তি গংগার তীর স্পর্শ করে। কয়েকবছর পর গংগার জলভাগ দূরে সরতে থাকে এবং পরিত্যক্ত স্থলভাগ ক্রমশঃ শক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। লোপেজ উক্ত জমির মালিকানা দাবী করেন। সদর আমিন বাদীর পক্ষে ডিগ্রী প্রদান করেন কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপীলে কোলকাতা হাইকোর্ট তা বাতিল করে দেন। বাদী হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়ের করেন। প্রিভি কাউন্সিল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যেহেতু বাদী উক্ত ভূমির দাবী কখনও পরিত্যাগ করেননি এবং এটা সনাক্তকরণ যোগ্য ছিল তাই বিবাদী একে পলিসঞ্চয় দ্বারা তার ভূমি বৃদ্ধি বলে দাবী করতে পারবেন না।

৬. বেংগল প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫

১৮৮৫ সনের বেংগল টিনাসী এন্ড বা প্রজাস্বত্ব আইন (সংক্ষেপে 'বিটি এন্ড' বলে পরিচিত) একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গৃহীত হয় এবং এর পেছনে অনেক যুগের আন্দোলন ছিল এবং এটা দেশীয় নেতাদের নেতৃত্ব ও প্রজার পরিচয় বহন করে। এ আইনে প্রজাদের বেশ কিছু অধিকার স্বীকৃত হয়। উক্ত বংগদেশ প্রজাস্বত্ব আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত প্রজা অনুমোদিত প্রজা হিসেবে গণ্য হয়ঃ—

- (ক) জোতদার ও অধীনস্থ জোতদার (Tenure-holder)
- (খ) রায়ত

(গ) অধীনস্থ রায়ত। অর্থাৎ রায়তের অধীনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জমি ধারণকারীরা।

উক্ত আইনের আওতায় নিম্নোক্ত রায়তদেরকে প্রজা বলে গণ্য করা হয়ঃ

- (ক) নির্দিষ্ট হারের খাজনার জমি ধারণকারী রায়ত - অর্থাৎ যে সমস্ত রায়তরা নির্দিষ্ট খাজনায় বা খাজনার নির্দিষ্ট হারে স্থায়ীভাবে জমিধারণ করেন।
- (খ) অধিকারী রায়ত- এধরনের রায়ত যারা যে জমিধারণ করেছেন সে জমিতে তাদের অধিকারকরণের অধিকার রয়েছে।
- (গ) অধিকারহীন রায়ত- যে সমস্ত রায়তের এররকম জমি অধিকারকরণের অধিকার নেই।

নির্দিষ্ট হারে খাজনা প্রদানকারী রায়তদেরকে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ প্রদান করা হয়ঃ-

- (ক) তারা তাদের অধিকারভুক্ত ভূ-সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃতভাবে হস্তান্তর করতে পারবে।
- (খ) জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যদি কোন নির্দিষ্ট শর্ত থেকে থাকে এবং সে শর্ত যদি উক্ত প্রজা ভোগ করে কেবলমাত্র তখনই তাকে উচ্ছেদ করা যাবে।
- (গ) উক্ত রায়ত ক্রমাগত ১২ বৎসর একই গ্রামে থাকলে তাকে স্থিরীকৃত রায়ত বলে গণ্য করা হবে।
- (ঘ) উক্ত রায়তের জমি চাষ করার, গাছ লাগানোর, গাছ কাটা ও ভোগ করার অধিকার থাকবে।

অধিকারী রায়তের নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ উক্ত আইনে স্বীকৃত হয়ঃ

- (ক) তিনি উক্ত ভূ-সম্পত্তিকে তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবেন, তবে উক্ত সম্পত্তির মান নষ্ট করতে পারবেননা। (যথা, কৃষি জমিকে খাল বানানো যাবে না)
- (খ) তিনি তার জমিতে গাছ লাগাতে পারবেন ও গাছ কাটতে পারবেন এবং গাছের ফলফুল, কাষ্ঠ ইত্যাদি ভোগ করতে পারবেন।
- (গ) তিনি যুক্তিসম্মতভাবে স্থিরীকৃত খাজনা প্রদান করবেন।
- (ঘ) তাঁকে খাজনা প্রদান না করার কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে উচ্ছেদ করা যাব না।
- (ঙ) তাঁর ভূ-সম্পত্তি তাঁর বংশধররা বংশানুক্রমে ভোগ করতে পারবে।
- (চ) তাঁর ভূ-সম্পত্তি তিনি প্রয়োজনে হস্তান্তর করতে পারবেন।

অধিকারহীন রায়তদের কেবলমাত্র নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ছিলঃ

- (ক) কেবলমাত্র চুক্তিবদ্ধ পরিমাণে খাজনা প্রদান করা।
- (খ) রেজিস্ট্রিকৃত দলিল অথবা ৪৬ নম্বর ধারার মামলা ব্যতীত খাজনার পরিমাণ বাড়ানো যাবেনা।

খাজনা বৃদ্ধি হলে খসড়া চুক্তি হিসেবে প্রজাকে প্রথমে জানাতে হতো। প্রজা ৩ মাসের মধ্যে অস্বীকৃতি জানাতে পারতো এবং অস্বীকৃতির তিন মাসের মধ্যে জমিদার উক্ত বিষয়ে মামলা করতে পারতেন।

উক্ত আইন অনুযায়ী অধিকারবিহীন প্রজাদেরকে নিম্নোক্ত কারণে উচ্ছেদ করা যেতঃ

- (ক) খাজনা আদায়ী হলে।
- (খ) চুক্তির শর্ত ভংগ করতঃ জমি ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে।
- (গ) চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে।
- (ঘ) ন্যায্য খাজনা প্রদান করা না হলে।

উক্ত আইন জোতদার শ্রেণী সৃষ্টি করে। জোতদার (Tenure-holder) বলতে প্রধানতঃ ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি ভূ-স্বামী (Proprietor) বা জোতদারের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে বা প্রজা স্থাপন করে তা চাষের অধীনে আনার জন্য জমিধারণ করার অধিকার অর্জন করেছেন। এরূপ অধিকার অর্জন করেছেন এরকম ব্যক্তির স্বার্থের উত্তরাধিকারদেরকেও জোতদার বলা হবে।

রায়ত বলতে প্রধানতঃ ঐ ব্যক্তিকে বুঝাতো যিনি নিজে বা তার পরিবারের লোকদের দ্বারা অথবা চাকর বা শ্রমিকদের দ্বারা বা অংশীদারদের সাহায্যে জমি রাখবার অধিকার অর্জন করেছেন। এরূপ ব্যক্তির স্বার্থের উত্তরাধিকারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে ভূ-স্বামী অথবা অন্য জোতদার এর অধীনে জমি ধারণ না করলে তাকে রায়ত বলা যেতনা। কোন প্রজা জোতদার না রায়ত তা নির্ণয় করার জন্য আদালত নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতেনঃ

- (ক) স্থানীয় রীতিনীতি,
- (খ) যে উদ্দেশ্যে প্রজাস্বত্বের অধিকার মূলতঃ অর্জন করা হয়েছিল,
- (গ) যে ক্ষেত্রে কোন প্রজার ১০০ বিঘার অধিক জমি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে অন্যরূপ বিরোধী কিছু না দেখানো হলে ঐ প্রজাকে জোতদার বলে মনে করা হতো।

উক্ত আইনে জোতদার ও রায়তের সংজ্ঞা অস্পষ্ট ছিল। কোন ব্যক্তির যার কোন সময় নিজের বা পরিবারের লোকজন দ্বারা বা চাকর-বাকর দ্বারা চাষ করাবার জন্য বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল, তা তার কাজের দ্বারা তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ অধীনস্থ রায়তের হাতে চলে যেতে পারতো। ফলে তিনি খাজনা গ্রহীতাতে পরিণত হতে পারতেন।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনে রায়ত কোন জমিদার বা জোতদারের চাষী প্রজা এবং অধীনস্থ রায়ত হলো রায়তের প্রজা। প্রত্যেক চাষীই যে রায়ত হবেন এমন নয়। রায়ত হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন জমিদার অথবা জোতদারের অধীনে প্রজা হিসেবে ভূমি চাষ করেন। সংশ্লিষ্ট চাষী ভূমিতে কোনরূপ স্বার্থবান কিনা এটাই বিচার্য বিষয় ছিল। যদি কোন ইজারার শর্তানুযায়ী ইজারা গ্রহণ কারীকে (Lessee) স্বয়ং জমিচাষ করতে হতো এবং অন্য প্রজাকে বন্দোবস্ত দেয়া যেতনা সেক্ষেত্রে ইজারা গ্রহণকারী জোতদার নয়, বরং রায়তরূপে গণ্য হতেন।

উক্ত আইনানুযায়ী যে সকল ব্যক্তি একাধিক্রমে ১২ বৎসর পর্যন্ত কোন গ্রামে অবস্থিত জমি রায়ত হিসেবে ধারণ করেছেন তাদেরকে সেই গ্রামের স্থিরীকৃত রায়ত হিসেবে গণ্য করা হয়। এরূপ ব্যক্তির একই গ্রামের জমি ধারণ করলে চলবে। এ জমি ভিন্ন ভিন্ন খন্ডও হতে পারে, নির্দিষ্ট জমি না হলেও চলতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে জমি লাভ করলে যে ব্যক্তির কাছ থেকে জমি পাওয়া গেল তাও এই নির্দিষ্ট ১২ বৎসরের অন্তর্ভুক্ত। স্থিরীকৃত রায়তকে একা অথবা অন্য লোকেরসহ অংশীদার হিসেবে জমিধারণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি একবার স্থিরীকৃত রায়তের একা অথবা অন্য লোকেরসহ অংশীদার হিসেবে জমিধারণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি একবার স্থিরীকৃত রায়তের মর্যাদা অর্জন করতে তার ঐ গ্রাম থেকে অপসারণের পরেও উক্ত মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে, যদি তিনি এক বৎসর সময়ের মধ্যে ঐ গ্রামে ফিরে আসেন এবং যে কোন জোতজমা গ্রহণ করেন। কোন রায়ত জমিদার কর্তৃক অন্যায়ভাবে উচ্ছেদকৃত হলে অবশ্য এক বৎসরের অধিককাল হলেও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

অধিকারী রায়ত ও স্থিরীকৃত রায়তের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সকল স্থিরীকৃত রায়তই অধিকারী রায়ত কিন্তু সকল অধিকারী রায়ত স্থিরীকৃত রায়ত নন। কোন ব্যক্তি নিজে অথবা অংশতঃ নিজে এবং অংশতঃ যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করেছেন তার মাধ্যমে কোন গ্রামে একাধিক্রমে ১২ বৎসর জমিধারণ করলেই কেবলমাত্র স্থিরীকৃত রায়ত হতে পারেন। কিন্তু অধিকারী রায়ত হতে হলে স্থিরীকৃত রায়ত হওয়া ছাড়াও অন্যভাবে যেমন, ক্রয়, উত্তরাধিকার, সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থিরীকৃত রায়ত নয় এরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে অধিকার হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। এতদ্ব্যতীত জমিতে অধিকার করে রাখার অধিকার ব্যতীত অধিকারী রায়ত হয় না। এমনকি জমিতে দখল থাকা স্বত্বেও কোন স্থিরীকৃত রায়তের জমিতে অধিকার করে রাখার অধিকার নাও থাকতে পারে, যথা, জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সরকার কর্তৃক ধারণকৃত জমি যা বছরের পর বছরের জন্য ইজারা দেয়া হয় এমন জমি অথবা উতবন্দী, চর বা দিয়ারা জমি যদি রায়ত উক্ত জমি একাধিক্রমে ১২ বছর পর্যন্ত ধারণ না করে থাকে অথবা কর্ম জোত বা ঘাটওয়ালী জোত।

উক্ত ১৮৮৫ সনের আইনের অগ্রক্রয়াদিকারের ব্যবস্থাও রাখা হয়। কোন জোত জমার কোন অংশ বা খন্ড হস্তান্তর করা হলে এক বা একাধিক সহ-অংশীদার কর্তৃক অগ্রক্রয়াদিকারের অধিকার প্রয়োগ করা চলতো। তবে উক্ত হস্তান্তর বিনিময়, ইজারা অংশ বিভাগ হিবা-বিল-এওয়াজ^৩ বাদে অন্য প্রকার হিবা বা ওয়াকফ অথবা ধর্মীয় বা দাতব্য কারণে উৎসর্গীকৃত হলে অগ্রক্রয়াদিকার করা যেতো না। নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ৩ মাসের মধ্যে এই অগ্রক্রয়াদিকার প্রয়োগের আবেদন করতে হতো। সম্পত্তির যে মূল্য নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে তা এবং অতিরিক্ত ১০% আদালতে জমা দেয়া অগ্রক্রয়াদিকার প্রয়োগের শর্ত ছিল।

৩. মুসলিম আইনে যে দানের পরিবর্তে কিছু প্রকৃত বা প্রতীক গ্রহীতা থেকে গ্রহণ করা হয়, তাকে 'হেবা-বিল এওয়াজ' বলে।

উক্ত আইনে সংরক্ষিত স্বার্থ সম্পর্কে বলা হয় যে যখন কোন জোত বা জোত জমা বকেয়া আদায়ের ডিগ্রী কার্যকরী করণের জন্য বিক্রয় হয় তখন সেখানে ফ্রেতার স্বার্থ রদ হয়না। এটাকেই সংরক্ষিত স্বার্থ বলা হতো। নিম্নলিখিতগুলি সংরক্ষিত স্বার্থের অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

- (ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে বিরাজমান অধীনস্থ জোত।
- (খ) কোন বর্তমান অস্থায়ী বন্দোবস্তের কার্যক্রম দ্বারা অধীনস্থ জোত ঐ বন্দোবস্তের সময়ের জন্য নির্ধারিত খাজনায় জোত হিসেবে অনুমোদিত।
- (গ) কোন ইজারা যার উপর বসতবাড়ী, কলকারখানা বা অন্য স্থায়ী গৃহাদি নির্মিত হয়েছে, অথবা যার উপর স্থায়ী বাগান পুকুর, খাল, উপাসনাগার, কবরস্থান, শ্মশান ইত্যাদি তৈরী হয়েছে।
- (ঘ) কোন আদালত কর্তৃক অথবা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত খাজনায় পাঁচ বৎসর পর্যন্ত জমিধারণ করছে এমন অধিকারী রায়তের অধিকার। বলা বাহুল্য কোন অধীনস্থ রায়তের অধিকার করে রাখার অধিকার থাকলেও তার স্বার্থ সংরক্ষিত স্বার্থ বলে গণ্য ছিলনা।
- (ঙ) উপরোক্ত প্রকারে ভূমি প্রদত্ত হলে ন্যায় ও যুক্তিসম্মত খাজনায় জমি ধারণ করে আছে এরূপ অধিকারী রায়তের উপর প্রদত্ত অধিকার।
- (চ) নির্ধারিত খাজনায় জমি ধারণ করে আছে এরূপ নির্ধারিত হারের রায়ত অথবা এরূপ খাজনার হারে রায়ত যে খাজনার হার বিশ বৎসরে পরিবর্তিত হয়নি।
- (ছ) যে জমিদারের নির্দেশে জোত বা জোতজমা বিক্রি হয়েছে অথবা তার পূর্ব স্বার্থাধিকারীর কোন স্বার্থ বা অধিকার যা খোলাখুলি বা লিখিতভাবে সাময়িকরূপে সৃষ্টি করার জন্য প্রজাকে অনুমতি প্রদান করা হয়।

১৮৮৫ সনের উক্ত বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন ভূমিতে চাষীর স্বত্ব বা অধিকার আদায়ের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি ছিল। উক্ত আইনে চাষী প্রজাদেরকে বর্ণিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতঃ প্রত্যক্ষ শ্রেণীর রায়তের স্বত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রতিখন্ড ভূমি জরিপ করতঃ রায়তের নাম, রায়তের শ্রেণী, জমির পরিমাণ ও শ্রেণী ও খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য সন্নিবিষ্ট খতিয়ান প্রণয়নের বিধান রাখা হয়। রায়তরা জমিতে তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও ভোগের জন্য জরিপে প্রণীত এ খতিয়ানের উপর নির্ভরশীল ছিল।

৭. ইস্ট বেংগল নন-এগ্রিকালচারাল টিন্যান্সি এ্যাক্ট ১৯৪৯

পূর্ব বাংলা অকৃষিজাত প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৪৯ অনুযায়ী অকৃষিজাত জমি বলতে এসব জমি বুঝানো হয় যেটা কৃষি বা ফলমূলের চাষ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণত বসত বাড়ী, চা- বাগান বা মূলতঃ কৃষিকাজের জন্য ইজারা প্রদানকৃত হয়ে অন্য কাজে ব্যবহৃত জমি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

উক্ত আইন অনুযায়ী অকৃষিজাত রায়ত বলতে রায়ত এবং অধীনস্থ রায়ত বুঝানো হয়। অকৃষিজাত রায়ত অকৃষিজাত জমি আবাসিক কারণে, শিল্প উৎপাদনের জন্য, ব্যবসা

বাগিচ্যের জন্য অথবা ধর্মীয় ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন। উক্ত আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী কোন রায়ত পাকা ঘর, মসজিদ, মন্দির বা অন্যান্য উপসনালয়, পুকুর খনন, কাঠ সংগ্রহ, পুষ্পোদ্যান ইত্যাদির জন্য উক্ত জমি ব্যবহার করতে পারেন। উক্ত আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী যখন কোন রায়ত কমপক্ষে ১২ বৎসরের জন্য ইজারা নেন তখন প্রিমিয়াম বা সেলামী ব্যতীরেকে যুক্তিসম্মত খাজনায় চিরস্থায়ীভাবে উক্ত লীজ নবায়ন করার অধিকারী হন।

উক্ত আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী যদি কোন অকৃষিজাত ভূমিতে প্রজা কোন লিখিত ইজারা না নিয়ে অথবা এক বৎসরের বেশী অথচ ১২ বৎসরের কম সময়ে উক্ত জমিতে অবস্থান করেন অথবা ইজারার কোন শর্ত না নির্ধারিত হয়ে থাকে তখন নিম্নোক্ত কারণে তাকে উচ্ছেদ করা যেতঃ

- (ক) উক্ত জমিকে যেভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন যদি জমিটি সেভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে,
- (খ) মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে।
- (গ) ৬ মাসের নোটিশ প্রদান করে।

তবে যদি তার উপর ঘর-বাড়ি নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে যুক্তিসংগত ক্ষতি পূরণ প্রদান ব্যতীত তাকে প্রজাস্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করা যাবেন।

উক্ত আইনের ২০ নম্বর ধারা অনুযায়ী একজন অধীনস্থ প্রজা এ আইনের শর্ত সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিগুলোর যে কোন একটি মাধ্যমে উচ্ছেদের দায়ে দায়ী হবে এবং অন্য কোন উপায়ে নহে, যথাঃ (ক) এ আইনের ৪ নম্বর ধারার উদ্দেশ্যে যদি কোন প্রজা তার অকৃষিজাত ভূমিটি এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে সে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। (খ) যে লিখিত ইজারার মাধ্যমে কোন অকৃষিজাত ভূমিতে প্রজা অবস্থান করছে তার মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে। তবে যদি কোন অকৃষিজাত ভূমিতে কোন প্রজা সুনির্দিষ্ট ইজারা ছাড়াই অবস্থান করতে থাকে তাহলে জমিদার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রজা ৬ মাসের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত হতে পারে।

যদি কোন প্রজা ও জমিদার কোন ভূমি উন্নয়নমূলক কার্যে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে ৬৫(২) ধারা মোতাবেক অকৃষিজাত ভূমির প্রজাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে, যদি না তার জমিদারের অন্য প্রজার স্বার্থের তাতে ব্যাঘাত ঘটে। ভূমি উন্নয়ন কাজের মধ্যে রাস্তা বা উপরাস্তার সুবিধাকরণ, আলো বাতাস চলার জন্য খোলা স্থানের ব্যবস্থা করণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা করণ, নর্দমা স্থাপনের ব্যবস্থাকরণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ভূমি উন্নয়নমূলক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং প্রজা কর্তৃক সম্পাদিত কর্মটি ভূমি উন্নয়নমূলক কিনা এ সম্পর্কে বিরোধ উত্থাপিত হলে কালেক্টর (ডিপুটি কমিশনার) তা নিষ্পত্তি করবেন এবং তার রায়ের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করা যেতে পারে এবং এরূপ আপীলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৮. ১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন

জমিদারী প্রথার বিভিন্ন কুফলের ফলে বিশ শতকের ত্রিশ দশকের দিকে জমিদারী উচ্ছেদ আন্দোলন ক্রমে তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। সরকার প্রজা ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃনির্ধারণের জন্য ১৯৩৮ সনে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এর নেতৃত্বে একটি ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন নিয়োগ করতে বাধ্য হন। ফ্লাউড কমিশন ক্ষতিপূরণ সহকারে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এর সুপারিশ করেন।

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশসমূহ ১৯৪৪ সনের বেংগল এডমিনিস্ট্রিটিভ ইনকোয়েরী কমিটি সমর্থন করে এবং সে অনুযায়ী জমিদারী উচ্ছেদের একটি বিল ১৯৪৭ সনে বেংগল লেজিসলেটিভ এসেমবলীতে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু দেশ বিভাগের কারণে ঐ সময় উক্ত পরিষদে তা আলোচিত বা গৃহীত হতে পারেনি। দেশ বিভাগের পর দেখা যায় যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে রায়তরা প্রায় ১০ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করেন, কিন্তু মধ্যস্বত্বের কারণে সরকারী কোষাগারে মাত্র ১৮৫ কোটি টাকা জমা হয় এবং বাকী অর্থ জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী পেয়ে থাকেন।^৪

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং প্রজা জনসাধারণের দাবীর প্রেক্ষিতে তদানীন্তন পূর্ব বংগ আইন পরিষদে ১৯৫০ সনে ইস্ট বেংগল একুইজিশন এন্ড টিন্যান্সী বিল উপস্থাপিত হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও সংশোধনীর পর ১৯৫১ সনের ১৬ই মে তারিখে উক্ত বিলটি আইনে পরিণত হয়। যদিও এটা ১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন তবু উপস্থাপিত বছরের সূত্র ধরে এটা ইস্ট পাকিস্তান স্টেট একোইজিশন এন্ড টিন্যান্সী এক্ট, ১৯৫০ নামে অভিহিত। উক্ত আইনের রূপরেখা নিম্নরূপ ছিল:

- (১) উক্ত আইন দেড়শ বছরের পুরানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে এবং উক্ত আইনে প্রকৃত চাষীদের সরাসরি সরকারকে খাজনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
- (২) উক্ত আইন ভূমি ব্যবস্থার সমস্ত মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন করে এবং তদসঙ্গে সকল খাস জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।
- (৩) উক্ত আইনে পরিবারের মাথা পিছু জমি নির্ধারণ করে দেয়া হয়। প্রথমে উক্ত পরিমাণ পরিবারপিছু ১০০ বিঘা বা মাথাপিছু ১০ বিঘা (যেটা বেশী) ছিল কিন্তু ১৯৫৮ সনে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর উক্ত পরিবার পিছু পরিমাণ ৩৭৫ বিঘায় উন্নীত করা হয়।
- (৪) কৃষি অর্থনীতিতে যাতে বিরূপ প্রক্রিয়া না হয় সে জন্যে কোন ক্ষেত্রে উক্ত আইনের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়। যথাঃ-ডেয়ারী ফার্ম, চিনিকলসমূহ বা বিদ্যুৎচালিত কারখানা সমূহ।
- (৫) উক্ত আইনে প্রজাদেরকে পূর্ণ অধিকারী স্বত্ব এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা দেয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে কোন মধ্যস্বত্ব স্থাপন রহিত করা হয়।
- (৬) জমিদারদেরকে তাদের আয় বন্ধ হওয়া জনিত ক্ষতি-পূরণ হিসাবে ক্ষতি পূরণ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়।
- (৭) উক্ত আইনে জমিদারদেরকে দেয় ক্ষতি পূরণের পরিমাণ নিম্নরূপ রাখা হয়ঃ

৪. দেখুন, Muhammad Ismail, Land Laws of East Pakistan, Part I (Dhaka:

সারণী-১

১৯৫০ এর জমিদারী উচ্ছেদ আইনে ক্ষতিপূরণের হার

নীট বার্ষিক আয়	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
৫০০ টাকা পর্যন্ত	উক্ত আয়ের এককালীন ১০ শতাংশ
৫০১ টাকা-২০০০ টাকা	,, ,, ,, ৮ শতাংশ
২০০১ টাকা-৫০০০ টাকা	,, ,, ,, ৭ শতাংশ
৫০০১ টাকা-১০,০০০ টাকা	,, ,, ,, ৬ শতাংশ
১০,০০১ টাকা-১২,০০০ টাকা	,, ,, ,, ৫ শতাংশ
২৫,০০১ টাকা-৫০,০০০ টাকা	,, ,, ,, ৪ শতাংশ
৫০,০০১ টাকা-১,০০,০০০ টাকা	,, ,, ,, ৩ শতাংশ
১,০০০০০ টাকার উপরে	,, ,, ,, ২ শতাংশ

উৎস : ১৯৫০ সনের ই-বি-এস-এ-টি আইন, ধারা ৩৭

- (৮) উক্ত আইনে সমবায়ী চাষাবাদ বা ঐচ্ছিক টুকরাকৃত জমির একত্রীকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়।
- (৯) খাস জমির বন্দোবস্তের পরিমাণ প্রয়োজনে বৃহদাকার খামার ও বিশেষতঃ দুগ্ধ খামারের জন্যে বর্ধন করার ব্যবস্থা রাখা হয়।
- (১০) কোন কোন খাস জমি অধিগ্রহণের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়। যথাঃ- চা-বাগান, রাবার চাষাবাদ ক্ষেত্র, ফলমূলের বাগান এবং বৃহৎ শিল্পের উৎসে ব্যবহৃত বাগানাদি।
- (১১) অকৃষিজাত উন্মুক্ত জমি, ওয়াকফ ও দেবোত্তর জমি অধিগ্রহণের আওতায় বাইরে রাখা হয়।

সরকারের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উক্ত আইনের ৩ ধারায় বলা হয় যে সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন জমিদারী নিজস্বায়ত্তে আনবেন। উক্ত প্রক্রিয়া প্রথমে বরিশাল থেকে শুরু হয়। ১৯৫৪ সনে মুসলীম লীগ নির্বাচনে পরাজিত হবার পর যখন ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় তখন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে উক্ত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সনের ১৪ই এপ্রিল তারিখে একটি সর্বজনীন গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার জমি সংক্রান্ত সকলরাজস্ব গ্রহীতার স্বার্থ নিজে প্রহণ করেন। এর ফলস্বরূপ অকৃষিজাত উন্মুক্ত জমির যুক্তিতে ইউসুফ আলী চৌধুরীর টেপাখোলা হাট সংক্রান্ত মামলা, ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পর্কে জীবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী, চৌধুরী তানভীর আহমদ

সিদ্ধিকী, মেহেদী আলম খান পরী ও অন্যান্য, রানী ভবানী, রাজেন্দ্র নারায়ন প্রমুখের ভিন্ন ভিন্ন রীট হাইকোর্টে দাখিলকৃত হয়। সরকার উপায়ত্তর না দেখে ১৯৬০ সনে ১২ নম্বর অধ্যাদেশ জারী করতঃ উন্মুক্ত অকৃষিজাত জমিসমূহ উক্ত আইনের আওতাধীন করেন।

উক্ত আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে অগ্রক্রয় (প্রিএমপশন) উল্লেখ্য। ১৮৮৫ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬ (এফ) ধারা অনুযায়ী কেবল শরীকরাই অগ্রক্রমের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনে পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদেরকেও উক্ত অধিকার প্রদান করা হয়। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে শরীকের ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সম্পত্তি বদলী করণের ক্ষেত্রে, ওয়াকফের ক্ষেত্রে, ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জমির ক্ষেত্রে উক্ত ক্রয়-অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়।

১৯৫০ সনের উক্ত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকলেও সে সময় আইনে জোতদারীপ্রথার উপর আঘাত দেয়া হয়নি। অথচ দেশ বিভাগের পূর্ব থেকেই বর্গা প্রথার বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন হয়েছিল। এর মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার এক বছর আগে সারা বাংলাদেশে বর্গা-প্রথা সংস্কারের দাবীতে অধিকারীদের ব্যাপক জংগী সংগ্রাম উল্লেখ্য।

১৯৪৭ সনে অবিভক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী জনাব হোসেন সোহওয়ারাওয়াদী বিদ্যমান ভাগ-চাষ প্রথার সংস্কার কল্পে আইনের এক খসড়াও তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের মধ্যে জোতদারদের প্রভাবের ফলে এ আইন শেষ পর্যন্ত পরিষদে উত্থাপিত হয়নি।^৫

৯. পরিত্যক্ত ও অর্পিত সম্পত্তি

ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুল্‌স (১৮৮২ সনের ১ নম্বর রুল্‌স) অনুযায়ী শত্রু সম্পত্তি সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর পাকিস্তান ত্যাগ করতঃ ভারতে গমনকারী সংখ্যালঘুদের জন্য উক্তবিধি বলবৎ রাখা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানীরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেল তখন তাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির বন্দোবস্তের ও প্রয়োজন পড়ে। ভারত বাংলাদেশের বন্ধু হওয়ায় পূর্বোল্লিখিত শত্রু সম্পত্তিকে ডেস্টেড প্রপার্টি (অর্পিত সম্পত্তি) নামাকরণ করা হয় এবং প্রপার্টি সম্পর্কে ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশনম্বর ২৯ জারী করা হয় যা পরবর্তীতে ৭৪ সনের প্রথমে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যাদেশ এবং তার পরে ৪৫ ও ৪৬ নং আইনে রূপান্তরিত হয়। এবাউনড প্রপার্টির ক্ষেত্রে ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১৬ উল্লেখ্য। পাকিস্তানীদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি প্রধানতঃ নগর এলাকায় ছিল।

১৯৬০ ও ১৯৬৪ সনের সাম্প্রদায়িক দাংগার পর ১৯৬৪ সনে ডিস্টার্বড পাসন্স রিহেবিলিটেশন অধ্যাদেশ (১৯৬৪ সনের ১ নং অধ্যাদেশ) জারী হয়। এতে বলা হয় যে, এ-দেখুন, অজয় রায়, বাংলাদেশের জুমি ব্যবস্থাঃ সংকট ও সমাধান (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক্‌স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১৯৮৩), পৃঃ ১০।

হিন্দুরা জমি বিক্রি করতে গেলে সরকারের অনুমতি লাগবে। এর উদ্দেশ্য যদিও বা মহৎ হতে পারে যাতে লোকেরা ঠকিয়ে বা ভয় দেখিয়ে অত্যন্ত কম দামে সংখ্যালঘুদের জমি ক্রয় করে না নেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে টাউটদের উপদ্রব খুব বেড়ে যায়। বাংলাদেশ হওয়ার পর সরকার এবাউন্ড ও ভেঞ্চার সম্পত্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বিশেষভাবে গঠিত কমিটির হাতে দেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেলা প্রশাসনতথা মহকুমা প্রশাসকের হাতেই বেশীরভাগে দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১০. স্বাধীনতা উত্তর সংস্কারাদিঃ

স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকার কয়েকটি জরুরী ভূমি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।^৬ যথাঃ

- (ক) ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কৃষি জমিতে আরোপিত বকেয়া ও সুদসহ সকল প্রকার ভূমি রাজস্ব মওকুফ করা হয়। ভূমি রাজস্ব মওকুফ হবার ফলে অবশ্য সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ৩৬ কোটি টাকা।
- (খ) ১৯৭২ সালের ১৪ই এপ্রিল থেকে ২৫ বিঘার কম জমির মালিক পরিবারকে ভূমি রাজস্ব প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অবশ্য এর ফলে সরকার বার্ষিক ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হন।
- (গ) প্রতিটি পরিবারের জন্য আবাদী জমির সর্বোচ্চ সীমা পুনর্বার ১০০ বিঘাতে কমিয়ে আনা হয় (প্রেসিডেন্টের আদেশ নং ৯৮/১৯৭২)
- (ঘ) সরকারী জমি বন্টনে সালামী নেয়া হবে না বলে স্থির করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের প্রতি বছর ৪ কোটি ৯০ লাখ টাকার আয় কমে যায়। ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন কৃষি পরিবারের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জমি বন্টন করা হবে বলে ঠিক করা হয়।
- (ঙ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকার বড় বড় খন্ডে অববায়িত জমি কৃষকদের সমবায়ের কাছে পত্তন দিবেন বলে স্থির করা হয়। এ সমবায়গুলোর ক্ষেত্রে প্রতিটি সদস্যকে অতিরিক্ত ১ একর করে জমি দেয়া হবে বলে বিধান দেয়া হয়। যেসব খন্ডে ৫০ থেকে ৫০০ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে সেগুলো সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে যোগ দেয়া শর্তে চাষীদের সাথে স্বতন্ত্রভাবে বন্দোবস্ত দেয়া হবে বলে স্থির করা হয় এবং যেসব খন্ডের আয়তন ৫০০ একরের বেশী (প্রধানতঃ উপকূলীয় অঞ্চলে) সেগুলো সমবায় চাষের জন্য গঠিত গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া হবে বলে সরকারী সিদ্ধান্ত হয়।
- (চ) ১৯৭৪ সালে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব), উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জমি বন্টন কমিটি গঠিত হয়।
- (ছ) ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১৩৫ অনুসারে সকল নদীগর্ভের জেগে ওঠা চর সরকারী খাস জমি হিসাবে সরকারের কাছে অর্পিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।
- (জ) মজা পুকুরসহ সকল পতিত জমি পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য একটি জাতীয় বোর্ড গঠনের ও পরিকল্পনা নেয়া হয়।

৬-দেখুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন (জানুয়ারী ১৯৮৩) পৃঃ ২১-২৪।

(বা) মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহীতাদের খাই খালাসী জমি মুক্ত করার বিষয়ে ১৯৭২ সালে বিধান দেয়া হয় যে, অনূর্ধ্ব ৭ বছরের মধ্যে খাই খালাসী সূত্র অনুযায়ী বন্ধককৃত জমি বন্ধকদাতার কাছে প্রত্যাগিত হবে।

(এ) হাট বাজারের ইজারাদারী প্রথা বিলোপ করা হয়। এর পরিবর্তে হাট বাজারের স্থায়ী দোকানদার ক্রেতা বিক্রেতা এবং ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি বেসরকারী কমিটি গঠন করা হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ নেয়ার ফলে চাষীরা খুব একটা লাভবান হননি, কারণ ২৫ বিঘার কম মালিকদের খাজনা মাফ ও সাধারণভাবে ভূমি কর হ্রাস করা হলেও অন্যদিকে বিবিধ কর ও উপকর আরোপিত হয়েছিল। ১৯৭৬ সনে এ ধরনের সব কর শুদ্ধকৈ ভূমি উন্নয়ন কর নামে একত্রিত করা হয়। যেহেতু কর ও উপকর সাধারণভাবে প্রকৃত ভূমি করের ৩০% ছিল সেহেতু এগুলো সংগ্রহের খরচ আনুপাতিক হারে মূল করের চেয়ে অধিক হয়ে দাড়ায়। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে ৯৯ ভাগ কৃষি পরিবারের ২৫ বিঘার কম জমি রয়েছে বিধায় প্রকৃতপক্ষে এতে সর্বনিম্ন আয় শ্রেণীর লোকদের বিশেষ রেহাই বলে ধরা যায়না।

১১. হাট বাজার ও গুচ্ছগ্রাম

গণ কমিটি কর্তৃক হাট বাজার ব্যবস্থাপনা করার বিধান ১৯৭৫ সালে ভেংগে দিয়ে ইজারাদারী প্রথা পুনঃজীবিত করা হয়। অনেক কমিটির সরকারী তহবিলের অপব্যবহার ও আত্মসাৎ, উচ্চ হারে শুল্ক সংগ্রহ কিন্তু হিসাবে কম দেখানো, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ইত্যাদি এর কারণ ছিল। পরবর্তীকালে কিছু কিছু হাট বাজারের ব্যবস্থাপনা পৌরসভার হাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং বাকীগুলো বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার কাছে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনায় সরকারী জমি চাষীদের পত্তন দেয়ার একটি কর্মসূচী সরকার হাতে নেন তবে উক্ত পরিকল্পনাটি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি এবং কর্মসূচীটি সমবায় সমিতি সমূহের সাথে সার্বিকভাবে সমন্বিত হতে পারেনি। তবুও ১৯৮৯ এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা ৩৪৬ এ দাঁড়ায়।

১২. ভূমি সংস্কার কমিটি

১৯৮২ সনে সরকার একটি ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করেন। ভূমি সংস্কার কমিটির দায়িত্ব হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করা হয়ঃ^৭

- (১) ভূমির অনুকূলতম উৎপাদন সম্ভাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অস্তিত্বমান ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সনাক্তকরণ;

- (২) উৎপাদনশীলতা বর্ধন এবং সম্পদ ও আয়ের ন্যায্যধর্মী বটন প্রসারণকল্পে ভূমি মালিকানা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার কাঠামোর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সুপারিশকরণ;
- (৩) সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক সংগঠন ও পদ্ধতির দিক নির্দেশনা।

কমিটির কার্যপরিধি সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমি সংস্কার বলতে কেবলমাত্র চাষযোগ্য ভূমি বুঝানো হয়। জলাশয়, জলমহল, হাট-বাজার, গোপথ, চারণভূমি ইত্যাদিও কমিটি আলোচনা করেন; তবে ওয়াকফ, দেবোত্তর জমি ও অর্পিত জমির বিশেষ সমস্যাদি এবং পাবর্ত্য চটগ্রাম, চা বাগান আবৃত জমি এবং অন্যান্য উপজাতীয় অঞ্চলের ভূমি মালিকানা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কে সংস্কারধর্মী দিক নির্দেশনা এতে স্থান পায়নি।

ভূমি সংস্কার কমিটি ১৯৮৩ সনে তাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশ পেশ করেন। তাদের সুপারিশসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখ্যঃ^৮

- (১) প্রত্যক্ষভাবে চাষকার্যে নিয়োজিত কৃষক পরিবারের ক্ষেত্রে কৃষি জমির (বসতবাড়ী ছাড়া) মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৭৫ মান (Standard) এবং অন্যান্য এলাকায় ১০০ মান বিঘায় নির্ধারিত হবে। অনুপস্থিত মালিক পরিবারের ক্ষেত্রে এই সীমা বন্যা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৩০ মান বিঘায় এবং অন্যান্য এলাকার ৫০ মান বিঘায় নির্ধারিত হবে। নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত জমি বা উদ্বৃত্ত জমি খাস জমি হিসাবে সরকারের কাছে অর্পিত বলে গণ্য হবে।
- (২) অর্পিত উদ্বৃত্ত জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনধিক ১০ বিঘার মালিক বা প্রজাষত্বের অধিকারী স্ব-চাষী পরিবার, বর্গাশর্তে ব্যবহারকারী বর্গাচাষী, অনধিক ১০ বিঘা জমির মালিক, ব্যবহারকারী পার্শ্ববর্তী জমির মালিক বা ব্যবহারকারীকে পত্তন দেয়া হবে।
- (৩) যে সব পরিবারের জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা বা কম তারা ৬০ বিঘার বেশী পাবে না।
- (৪) যেক্ষেত্রে ভূমির মালিক (শ্রম ব্যতীত) উৎপাদনের সকল উপকরণ ব্যয় বহন করেন, সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের ৬৭ $\frac{১}{২}$ % এবং যেক্ষেত্রে বর্গাচাষী (শ্রম ব্যতীত) সকল উৎপাদন উপকরণ বহন করেন, সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের ৩৩ $\frac{১}{২}$ % এবং যেক্ষেত্রে ভূমি মালিক বর্গাদারের সাথে সমভাবে (শ্রম ছাড়া) সকল উপকরণ ব্যয় বহন করেন সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের ৫০% ভূমি মালিককে দেয়া হবে।
- (৫) বেনামীতে জমি মালিকানা সংরক্ষণ ও হস্তান্তর সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
- (৬) চর অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত যে সব স্থল বিশিষ্ট জলমহল মাছ উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে কিংবা আনা সম্ভব, সেগুলোর নিয়ন্ত্রন মৎস্য বিভাগের প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কাঠামোয় রাখতে হবে।
- (৭) পৌর এলাকায় অবস্থিত হাট বাজার পৌরসভার কাছে, থানা সদরে অবস্থিত হাট-বাজার থানা পরিষদকে (পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদকে) ইজারা দিতে হবে। গ্রামে অবস্থিত হাট বাজারের নিয়ন্ত্রণ ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম পরিষদের কাছে থাকবে এবং এসবের

ব্যবস্থাপনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট গ্রামে ভূমিহীন বা ভূমিস্বল্প কৃষকদের সমবায় সমিতিসমূহকে দায়িত্ব দিবে। থানা পরিষদ হাট-বাজারের আয়ের ১% সরকারকে দেবেন, ৯% নিজ তহবিলে জমা করবেন, ১০% হাট-বাজার উন্নয়নে প্রযোজিত করবেন এবং ৮০% ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ভূমিহীন বা ভূমিস্বল্প সমবায় সমিতির জন্য নির্দিষ্ট রাখবেন।

- (৮) জেগে উঠা চর জমির সত্ত্বর জরীপ ও পত্তনের জন্য জেলা প্রশাসক বিশেষভাবে দায়ী থাকবেন। চর উঠার অনূর্ধ্ব তিন মাসের মধ্যে জরীপকার্য সম্পন্ন করতে হবে এবং জরীপকাজ শেষ হওয়ার অনূর্ধ্ব তিন মাসের মধ্যে খাসজমি পত্তন পাওয়ার যোগ্য পার্শ্ববর্তী এলাকার স্ব-চাষী বা ভূমিহীন ও ভূমিস্বল্প চাষীকে পত্তন দিতে হবে।
- (৯) খোরপোষের নিম্নতম প্রয়োজনে মজুরীর সর্বনিম্ন মাত্রা ৩ $\frac{১}{২}$ সের চালে বা সমপরিমাণ টাকার অংকে নির্ধারণ করতে হবে এবং সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আদর্শ নিয়োগকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সরকার ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশসমূহের অধিকাংশই গ্রহণ করেন এবং এজন্য ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪, ভূমি সংস্কার বিধিমালা ১৯৮৪ এবং কৃষি শ্রমিক (নিম্নতম মজুরি) অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারীকৃত হয়। এতদ্ব্যতীত মহাজনী ঋণের কবল থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ঋণ সালিশী অধ্যাদেশ ১৯৮৮ও জারী করা হয়।

১৩. ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪

উক্ত অধ্যাদেশের প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নরূপ করা হয়:-

- (১) যিনি বা যার পরিবার ৬০ মানানসহ বিঘা অপেক্ষা অধিক কৃষি জমির অধিকারী আছেন এমন কোন মালিক হস্তান্তর, উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে নতুন কোন কৃষি জমি অধিগ্রহণ করবেন না এবং যার বা যার পরিবারের ৬০ মানানসহ বিঘার কম জমি রয়েছে তিনি নতুন অধিগ্রহণে ৬০ মানানসহ বিঘার বেশী অধিকারী হতে পারবেন না।
- (২) বেনামীভাবে কোন স্থাবর সম্পত্তির লেন-দেন করা যাবে না।
- (৩) পল্লী এলাকার মনিব কর্তৃক বাস্তব হিসাবে ব্যবহৃত কোন জমি কোন অফিসার, আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা আটক, ফ্রোক, বাজেয়াপ্ত করণ বা বিক্রয়সহ সকল আইনগত প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি পাবে এবং এরূপ জমির মনিবকে কোন উপায়েই উক্ত জমি থেকে বঞ্চিত, বেদখল বা উচ্ছেদ করা যাবে না।
- (৪) কোন বর্গাচুক্তি পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য বৈধ থাকবে।
- (৫) বর্গাজমির উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ মনিব জমির জন্য গ্রহণ করবেন, বর্গাদার শ্রমের জন্য এক তৃতীয়াংশ নেবেন এবং মনিব বা বর্গাদার উভয়ে চাষের পরিব্যয়ের সমানুপাতে এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবেন।

১৪. ভূমি সংস্কার বিধিমালা ১৯৮৪

উক্ত বিধিমালা দ্বারা ভূমিসংস্কার অধ্যাদেশের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয় যথা:-

- (১) অতিরিক্ত যেসব জমি সরকারের হাতে নিহিত হবে, সেক্ষেত্রে ৫০ বিঘা পর্যন্ত উক্ত জমির বাজার মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ হারে এবং তদুর্ধ্ব জমি শতকরা ১০ ভাগ হারে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
- (২) বর্গাচুক্তির জন্য 'চ' ফরম, বর্গাদারের মৃত্যুতে 'ঝ' ফরম, উৎপন্ন ফসলের ভাগের জন্য 'ট' ফরম নির্ধারিত হয়।

১৫. কৃষি শ্রমিক (নিম্নতম মজুরি) অধ্যাদেশ ১৯৮৪

উক্ত অধ্যাদেশ কৃষি শ্রমের মজুরীর নিম্নতম হার দিনপ্রতি ৩২৭ কিলোগ্রাম চাউল অথবা স্থানীয় বাজারে ঐ পরিমাণ চাউলের দামের সমান পরিমাণ অর্থ হবে। এ নিয়ম অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মজুরী ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য গ্রাম্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন এবং দিগুণ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পেতে পারবেন।

১৬. বাংলাদেশ ঋণ সালিসি অধ্যাদেশ-১৯৮৮

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নম্বর ৩৬) ১৯৮৮, ১৪ই এপ্রিল ১৯৮২ই অর্থাৎ ১লা বৈশাখ ১৩৮৯ বাংলা তারিখ থেকে কার্যকর হয়। মহাজনী ঋণের কবল থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করা এর উদ্দেশ্য ছিল। মহাজনী ঋণ বলতে লিখিত বা মৌখিক চুক্তি বলে জামানতসহ বা জামানত ব্যতীরেকে টাকায় বা শস্যে বা শস্য বীজে পরিশোধযোগ্য এমন ঋণ বুঝায় যা টাকায় পরিশোধের ক্ষেত্রে আসল ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা বা তদুর্ধ্বহারে পরিশোধ্য এবং শস্যে বা শস্য বীজে পরিশোধের ক্ষেত্রে আসল ঋণের উপর বার্ষিক এক পঞ্চমাংশ বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ অতিরিক্ত শস্য বা শস্যবীজসহ পরিশোধ্য। উক্ত অধ্যাদেশের ৪নং ধারায় বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি ঋণের জামানত হিসাবে কোন কৃষকের কাছ থেকে তার দস্তখত বা টিপসইযুক্ত অলিখিত স্ট্যাম্প কাগজ গ্রহণ করতে পারবেন না। ৫ নম্বর ধারা মতে কোন ব্যক্তি মহাজনী ঋণের শর্ত হিসাবে ঋণ গ্রহীতার জমির উৎপাদিত ফসল কোন প্রকারের অগ্রিম ক্রয় করতে পারবেন না বা তাঁর বাড়ীতে বা তাঁর নির্ধারিত কোন স্থানে উঠাতে পারবেন না।

উক্ত আইনের ৬নং ধারা মোতাবেক অনধিক ৫ একর জমির মালিক কোন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা জীবনধারণে অক্ষমতা জনিত ও অসহায়তার কারণে কোন কৃষিজমি বিক্রয় করলে এবং উক্ত জমির বিক্রয়মূল্য অনধিক ৩০ হাজার টাকা হলে বা বিক্রীত জমির পরিমাণ অনধিক ১ একর হলে উক্ত কৃষক বোর্ড গঠিত হবার ৬ মাস বা বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রী হবার ৬ মাস যেটা পরে হয় এর মধ্যে উক্ত বিক্রয়কে খাই খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করবার জন্য বোর্ডে দরখাস্ত করতে পারবে, এবং বোর্ড শুনানীর পর দরখাস্তের যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে উক্ত বিক্রয়কে ৭ বৎসর মেয়াদী খাই খালাসী বন্ধক হিসাবে ঘোষণা করবে। অনুরূপভাবে উক্ত আইনের ৭নং ধারা অনুযায়ী কোন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা জীবনধারণে অক্ষমতা জনিত ও অসহায়তার কারণে অনধিক ৩০ হাজার টাকা মূল্যের কোন কৃষি জমি বা

অনধিক ১ একর পরিমাণ কৃষি জমি বিক্রয় করলে এবং উক্ত জমির বিক্রয়মূল্য বিক্রয়কালীন সমশ্রেণীর জমির প্রচলিত বাজার মূল্য থেকে বেশী হলে উক্ত কৃষক এ বিক্রয় বাতিল ঘোষণা করার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরখাস্ত করতে পারবেন।

মহাজনী ঋণ লাঘবকল্পে ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোন মহাজনী ঋণ গ্রহীতা তদকর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং এর উপর প্রদেয় সুদের ন্যায়সংগত হারও পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণের জন্য বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করলে বোর্ড গৃহীত ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং টাকায় পরিশোধ্য ঋণের ক্ষেত্রে অনধিক শতকরা বার্ষিক ২০ টাকা হারে এবং শস্য বা শস্যবীজে পরিশোধ্য ঋণের ক্ষেত্রে আসল ঋণের বার্ষিক অনধিক এক পঞ্চমাংশ হারে সুদনির্ধারণকরবেন।

উক্ত আইনে একজন চেয়ারম্যান ও অন্যান্য ২ এবং অনধিক ৪ সদস্য সমন্বয়ে ঋণ সালিসি বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলার অতিরিক্ত কালেক্টরের কাছে আপীলের ব্যবস্থা রাখা হয়। বোর্ড প্রদত্ত কোন আদেশে অমান্য করলে অথবা বোর্ড বা আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে ভুল তথ্য প্রদান করলে অনধিক ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডেরই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবে জেলা প্রশাসকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে এ ধারায় অভিযুক্ত করা যাবে না।

১৭. রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৯১ এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৯১

প্রথম অধ্যাদেশ ১৯৯১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী জারীকৃত হয়। নদীগর্ভে বিলীন ভূমি ২০ বৎসরের মধ্যে জেগে উঠলে মালিক বা তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাৎক্ষণিকভাবে তা পুনর্দখল করতে পারবে বলে উক্ত অধ্যাদেশে বিধান রাখা হয় এবং এজন্য রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা সরকারকে প্রদান করতে হবে। তবে যদি মালিকের দখলে ইতিমধ্যেই ৬০ বিঘা জমি থাকে তাহলে ষাট বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের কাছে ন্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে ভাংগনের কারণে মালিক বা তার উত্তরাধিকারীরাও খাজনা বা অংশবিশেষ থেকে ন্যায় সংগত ভাবে রেহাই পাবে। কিন্তু ৯ই মার্চ ১৯৯১ তে জারীকৃত উল্লিখিত দ্বিতীয় সংশোধনীতে প্রথম সংশোধনী এমনভাবে রহিত করা হয় যেন তা কখনও প্রণয়ন বা জারীকৃত হয়নি।^৯

১৮. ভূমি জরীপ ব্যবস্থা

ভূমি মালিকানা ও ভূমি বন্দোবস্ত প্রধানতঃ ভূমি জরীপের উপর নির্ভরশীল। সরকার ১৯৮৮ সনে একটি ভূমি রেকর্ড ও জরীপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটি গঠন করেন। উক্ত

^৯ দেখুন, Amendment of sec 86 of EBSAT Act under State Acquisition and Tenancy (Amendment) Ordinance, 1991 and State Acquisition and Tenancy (Second Amendment) Ordinance, 1991

কমিটি ১৯৮৯ সনের জুলাই মাসে তাদের প্রতিবেদন দেন। উক্ত কমিটি জরীপ ও খতিয়ান প্রণয়নের ১০টি ধাপ যথাঃ টাভার্স সার্ভে, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, সীমানা চিহ্ন নির্মাণ, খানাপুরী, বুঝারত, তসদিক, খসড়া খতিয়ান প্রকাশনা, আপত্তি দাখিল ও নিষ্পত্তি, আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং খতিয়ান চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশনা চিহ্নিত করেন। ঐতিহাসিকভাবে ১৮৮৯ সন থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্ত যে জরীপ পরিচালিত হয়েছিল, তা ক্যাডাস্ট্রাল বা কিস্তোয়ার জরীপ নামে পরিচিত। অতঃপর ১৯৪৪ সনে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় সংশোধনী জরীপের কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জরীপের কাজ বন্ধ থাকে। অতঃপর ১৯৪৫ সনে ফরিদপুরে এবং ১৯৫২ সালে বরিশাল জেলায় সংশোধনী জরীপকাজ সমাপ্ত হয় এবং খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়। ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেতে সংক্ষেপে সি, এস জরীপ এবং সংশোধনী জরীপ বা রিভিশন্যাল সার্ভেতে সংক্ষেপে আর, এস জরীপ বলা হয়।

টাভার্স সার্ভেতে মৌজার সীমানার চতুর্দিকে ও মৌজার অভ্যন্তরে কয়েকটি বাঁশের খুঁটি স্থাপন করতঃ খুঁটি সমূহের কোণ ও পারস্পরিক দূরত্ব প্রমাণ করা হয়। ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেতে বহুবুজ্জ এলাকাকে সরেজমিনে সুবিধাজনকভাবে কয়েকটি মোররা বা চতুর্ভুজে বিভক্ত করা হয়। খানাপুরীতে ব্লপ্লটে প্রদর্শিত প্রত্যেক ভূমি খণ্ডে উত্তর পশ্চিম কোন থেকে দাগ নম্বর দেয়া হয় এবং জমি মালিকের নাম, ঠিকানা, জমির শ্রেণী ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। বুঝারত পর্যায়ে প্রণীত খসড়া খতিয়ানের একটি কপি পূর্ব নির্ধারিত তারিখে স্থানীয়ভাবে ভূমি মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং তসদিক পর্যায়ে তথ্যগত কোন ভুল থাকলে বিনামূল্যে মালিক নির্ধারিত ফর্মে আপত্তি উপস্থাপন এবং তসদিক অফিসার কর্তৃক খতিয়ান সংশোধন করাতে পারেন।

মূল্যায়ন কমিটি জরীপ ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটির উল্লেখ করেন এবং কতিপয় নির্দিষ্ট সুপারিশ রাখেন। যথাঃ^{১০}

- (১) ভূমি মালিকের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তহশিল অফিসে ভূমি মালিকের মৃত্যুর রিপোর্ট ও দরখাস্ত দাখিল করেন তার বাধ্যতামূলক আইনগত বিধান করতে হবে।
- (২) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক যাতে ভূমি মালিকদের মৃত্যুর ত্রৈমাসিক রিপোর্ট নিয়মিতভাবে তহশিল অফিসে সরবরাহ করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (৩) কার্যকর প্রশাসনিক তদারক এবং আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তহশিলদারগণ যাতে নামজারী সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- (৪) রেজিস্ট্রেশন আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাদি সংশোধনক্রমে রেজিস্ট্রির জন্য নির্ধারিত ফরমে ভূমি হস্তান্তরের দলিল দাখিল করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
- (৫) ভূমি হস্তান্তরের দলিল রেজিস্ট্রি করার সময় আয়কর পরিশোধ সার্টিফিকেটের ন্যায় ভূমি রাজস্ব ও করাদি পরিশোধের দাখিল ব্যতীরেকে রেজিস্ট্রি নামজারী করার বিধান করতে হবে।

১০. দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটি রিপোর্ট (জুলাই ১৯৮৯), পৃঃ ২১১-২১৪।

(৬) সরকারের খাস জমি বন্দোবস্তের নিয়মাদি পালন করতঃ উক্ত জমির বন্দোবস্ত চূড়ান্তকরণ এবং কবুলিয়ত ও পাট্টা সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে ও তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার সমূহ সংশোধন করতে হবে।

(৭) জেলা রেকর্ডরুম, রাজস্ব সার্কেল অপিস ও তহশিল অফিসে তামিল রেজিস্টার নামীয় একটি রেজিস্টার রাখতে হবে এবং তাতে উদ্ধৃতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বা আদালতের আদেশে অনুসারে রেকর্ড সংশোধনের নোট রাখতে হবে।

(৮) জরুরী জাতীয় প্রয়োজনে ম্যাপের মত রেকর্ডও যাতে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় কোন স্থানীয় রেকর্ড রুমে রেকর্ড বিনষ্ট হলেও যাতে নির্ভরযোগ্য রেকর্ডের অভাব না ঘটে সেজন্য জরিপ মহা-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় রেকর্ড রুম রাখতে হবে।

(৯) শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিকেন্দ্রীকরণের প্রশাসনিক নীতির খাতিরেই নয়, জনসাধারণের সুবিধা ও ঘনিষ্ঠ তদারকের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের কার্যকারিতা বিধানের স্বার্থেও বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও তত্ত্বাবধান দায়িত্ব পর্যাগতভাবে ন্যস্ত করতে হবে।

সরকার মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনা করেন এবং অধিকাংশ সুপরিশদই বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের পথে রয়েছে।

১৯. ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রাধান্য

ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমি ব্যবস্থাপনাকেই কেন্দ্র করে এদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভূমি রাজস্ব নিশ্চিত করণ ও পরিদর্শনের জন্যই ১৭৬৯ সালে ইউরোপীয়ান সুপারভাইজার নিয়োগ করেন যা পরবর্তীতে কালেক্টার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টার ও ডিপুটি কমিশনার নামে রূপান্তরিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব রেভিনিউ বোর্ড অব রেভিনিউ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিজ ঐতিহ্য সমুন্নত রেখেছে। ১৮২৯ সনে সৃষ্ট কমিশনার পদটিও প্রধানতঃ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায় ভিত্তিক ছিল। আজকের দিনে ভূমি রাজস্ব বা ভূমি উন্নয়ন কর সরকারের মোট রাজস্বের একটি নগণ্য অংশ মাত্র কিন্তু ভূমি প্রশাসন প্রশাসনের একটি বিরাট বিষয়। জরীপ কার্য সমাধাকরণ, জমিজমার রেকর্ড অব রাইট সংরক্ষণ, খাসজমি উদ্ধার, খাস জমি ও সায়েরাত মহলাদির বন্দোবস্ত প্রদান, চর এলাকার ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশুনা করণ, ওয়াক্ফ, দেবোত্তর, অপিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারের বিরাট দায়িত্ব।

যদিও তহশিল অফিসগুলি প্রধানতঃ ভূমি রাজস্ব ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায়কারী হিসাবে পরিচিত কিন্তু ঐ অপিস এবং ঐ উপরস্থ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিসকে অনেক পরোক্ষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। ১৯৮২ সালে গঠিত ভূমি সংস্কার কমিটি মন্তব্য করেন যে, গড়ে প্রতি দুই ইউনিয়নের জন্য একটি তহশিল অফিস আছে। ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত কার্যক্রম সফল করার জন্য দরকার হবে প্রতি ইউনিয়নে একটি তহশিল বা অন্য কথায় গড়ে প্রতি কুড়িটি গ্রাম অর্থাৎ প্রায় ২২০০০ অধিবাসী বা ৪৫ হাজার পরিবারের জন্য একটি তহশিল। তহশিলদারদের বিশেষ দায়িত্ব হবে (১) জমির

মালিকানা ও চাষ-স্বত্বমূলক সকল তথ্য খতিয়ানভুক্ত করণ, (২) ওয়ারিশ বা হস্তান্তর সূত্রে এসব মালিকানা ও চাষ-স্বত্বের বিধি শুদ্ধ ও অনুমোদিত পরিবর্তনের দ্রুত নথিভুক্তকরণ, (৩) মালিকানার সীমার ভিত্তিতে ভূমিভিত্তিক সকল প্রগতিশীল কর আরোপণের ও সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে কর্মকরণ, (৪) সকল অপত্তনযোগ্য খাসজমির রক্ষণাবেক্ষণ ও পত্তনযোগ্য খাসজমির যোগ্যতার ভিত্তিতে ভূমিহীন ও ভূমিস্বল্প চাষার অনুকূলে পত্তন প্রদান এবং (৫) কৃষি ঋণ সরবরাহকারী অর্থ-প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি সরবরাহ করণ।^{১১}

১৯১৩ সনের বোর্ড অব রেভিনিউ আইন অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদির তত্ত্বাবধান ও নিষ্পত্তি করণের প্রধান দায়িত্ব ছিল বোর্ড অব রেভিনিউ এর। একজন সিনিয়র মেম্বর এর প্রধান রূপে দায়িত্ব পালন করতেন। স্বাধীনতার পর বোর্ড অব রেভিনিউয়ের দায়িত্ব প্রথমে ভূমি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে, কিন্তু পরবর্তীতে সরকার ভূমি প্রশাসন বোর্ড গঠন করেন। ভূমি আপীল বোর্ড (সংশোধন) আইন ১৯৯০ অনুযায়ী বোর্ডের কোন আদেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তিনি আদেশটি প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে তা পুনর্বিবেচনার জন্য বোর্ডের কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারবেন। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আপীল শোনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। বঙ্গাবাহুল্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিম বাংলা প্রদেশে পশ্চিম বংগ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৮১ এর আওতায় জেলা ভূমি সংস্কার অফিসার, মহকুমা ভূমি সংস্কার অফিসার ইত্যাদি ছাড়াও ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য সফল করণের জন্য ভূমি কর্পোরেশন গঠনের ব্যবস্থাও রয়েছে।^{১২}

সরকার ইতিমধ্যে ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা ও ভূমিউন্নয়ন কর এবং পঞ্চ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুদসহ মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে ভূমি প্রশাসন হয়তবা কিছুটা ভারমুক্ত হবে।

২০. উপসংহার

উপরের বর্ণিত আইনসমূহ ছাড়া আরও অনেক আইন রয়েছে সেগুলি পদানতঃ ভূমি কেন্দ্রিক যথাঃ ১৮৭৫ সনের সার্ভে আইন, ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর করণ আইন, ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৮৮২ সনের পথাধিকার (Easement) আইন ইত্যাদি। মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। কাজেই বিভিন্ন আইনে সাধারণ মানুষের কতটা উপকার হচ্ছে, ভূমির উৎপাদনশীলতা কতটুকু বাড়ছে, ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ কতটা কমছে, ভূমিহীন ও স্বল্প বিত্ত কৃষকের অবস্থার কতটুকু উন্নতি হচ্ছে—ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ধারায় সেটাই বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

১১. ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৮৩, পৃঃ ৫৩।

১২. Government of West Bengal "An outline of the functions of the Board of Revenue and Land & Land Reforms Department..... in the State of West Bengal" (Mimeo) (Undated), pp. 12-13.

গ্রন্থপঞ্জী

১. অজয় রায়, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা: সংকট ও সমাধান, ঢাকা:
বাংলাদেশ বুক্‌স্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১৯৮৩
২. এমাজউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), ভূমি সংস্কার, ঢাকা: বুক সোসাইটি, ১৯৮২
৩. কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ঢাকা:
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, ১৯৮১
৪. মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া, ভূমি, জরীপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ঢাকা: বই স্টলস, ১৯৯০
৫. সিরাজুল ইসলাম, ভূমি সংস্কার ও সমাজ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৮৩
৭. ঐ ভূমি রেকর্ড ও জরীপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট, ১৯৮৯
৮. Ismail, Muhammad, Land Laws of East Pakistan, Part I Dhaka : Progressive Publishers 1963
৯. Kabir, L. Land Laws in East Pakistan, Vol. I, II, III.
Dhaka: Star Press, 1961
১০. West Bengal, Govt. of "An outline of the Functions of the Board of Revenue and Land & Land Reforms Departmentin the state of West Bengal"
(Mimeo) (Undated).
১১. সৈয়দ তায়েফুল ইসলাম, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আইন, ঢাকা: বাংলাদেশ ল' বুক সেটার
১৯৮৯।